আবূ সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সা)-এর যুদ্ধ-প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত (সা)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে কাসীর'-এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম (সা) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

মক্কা বিজয়কালের উদারতা ঃ কোরাইশদের যে সকল নেতা ইসলামের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না, তারা মক্কা বিজয়ের এ সুযোগে ইসলাম গ্রহণ করে নেন, যারা সেসময়ও নিজেদের পূর্বতন কুফরী ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক ছাড়া বাকি সকলের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) পয়গম্বরী আদর্শের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা প্রতিপক্ষ থেকে মোটেই আশা করা যায় না। তিনি সেদিন কাফিরদের সকল শত্রুতা, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, আজ তোমাদের সেকথাই বলব, যা ইউসুফ (আ) আপন ভাইদের বলেছিলেন, যখন তারা পিতামাতা সহকারে ইউসুফের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে মিসর পৌঁছেন। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ لا تثريب عليكم اليوم "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। (প্রতিশোধ নেওয়া তো পরের কথা)।

মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের চার শ্রেণী ও তাদের ব্যাপারে হুকুম আহ্কাম ঃ সারকথা, মক্কা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে। মক্কা ও তার আশপাশে অবস্থানকারী অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হয়। কিন্তু সে সময় অমুসলমানেরা ছিল অবস্থানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। এদের এক শ্রেণী হল, যাদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি হয় এবং যারা পরে চুক্তি লংঘন করে। বস্তুত এ চুক্তি লংঘনই মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যাদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। এরা সে চুক্তির উপর বহাল থাকে। যেমন বনূ কিনানার দু'টিগোত্র, বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ। তফসীরে খাযিন-এর বর্ণনা মতে সূরা বরাআত নাযিল হওয়ার সময় এদের চুক্তির মেয়াদকাল আরও নয় মাস বাকি ছিল। তৃতীয় শ্রেণী হল, যাদের সাথে সন্ধি হয়েছিল কোন মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করা ব্যতীত। চতুর্থ হল, যাদের সাথে আদৌ কোন চুক্তি হয়নি।

মক্কা বিজয়ের আগে রসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিক বা আহলে কিতাবদের সাথে যতগুলো চুক্তি করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ওরা গোপনে ও প্রকাশ্যে চুক্তির শর্ত লংঘন করে এবং শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে রসূলুল্লাহ্ (সা)

ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সেজন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) এসকল ধারাবাহিক তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও আল্লাহ্র ইঙ্গিতে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে এদের সাথে সন্ধির আর কোন চুক্তি সম্পাদন করবেন না, এবং আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে শুধু মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে মক্কা নগরী তথা আরব ভূ-খণ্ড মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর অমুসলমানদের প্রতি আরব ভূমি ত্যাগের নোটিশ দেওয়া যেত। কিন্তু ইসলামের উদার ও ন্যায়নীতি সর্বোপরি রাহমাতুল্লীল আলামীন (সা)-এর অপরিসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার প্রেক্ষিতে তাদের সময় দেওয়া ব্যতীত ভিটামাটি ত্যাগের নির্দেশ দান ছিল বেমানান। সে কারণে সূরা বরা-আতের শুরুতে উপরোক্ত চার শ্রেণীর অমুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম-আহ্কাম নাযিল হয়।

কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হল প্রথম শ্রেণীভুক্ত। হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে এরাই লংঘন করেছে। তাই ওরা অধিক সময় পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সময়টি ছিল নিষিদ্ধ মাসগুলোর, যাতে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ। তাই সূরা তওবার পঞ্চম আয়াতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়ঃ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الاية যার সারকথা হল, এরা চুক্তি লংঘন করে নিজেদের কোন অধিকার বাকি রাখেনি। তবে নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা আবশ্যক। অতএব এরা নিষিদ্ধ মাস শেষ হতেই যেন আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করে কিংবা মুসলমান হয়ে যায়।' নতুবা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

যে লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি হয় এবং তারা এর উপর অবিচলও থাকে, তারা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাদের সম্পর্কে সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বলা হয়ঃ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم الاية

"কিন্তু যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ এবং যারা চুক্তি পালনে কোন ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন লোকের সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করে চল তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন'। এরা হল বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রীয় লোক। এ আদেশ বলে তারা নয় মাসের সময় লাভ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাপারে হুকুম আছে এ সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে। সেখানে বলা হয়ঃ براءة من الله ورسوله الاية অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ। তাদের জানিয়ে দাও যে, তোমরা এ দেশে আর মাত্র চার মাসকাল বিচরণ কর

আর মনে রেখ, তোমরা কখনও আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌ নিশ্চয় কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত মতে মেয়াদ ধার্য করা ব্যতীত যাদের সাথে চুক্তি হয়, কিংবা যাদের সাথে কোন চুক্তিই হয়নি, তারা চার মাসকাল সময় লাভ করে। চতুর্থ আয়াত মতে যাদের সাথে মেয়াদ ধার্য করে চুক্তি হয়, তারা মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সময় পায়। আর পঞ্চম আয়াত মতে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত---মক্কার মুশরিকদের সময় দেয়া হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় দেয়ার উদারনীতি ঃ ইসলামের উদারনীতি মতে উপযুক্ত আদেশাবলীর প্রয়োগ ও সময় দান---এ দু'য়ের শুরু সাব্যস্ত করা হয়। আরবের সর্বত্র এ সকল ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে, আর এগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয় নবম হিজরীর হজ্বের মৌসুমে মিনা ও আরাফাতের সাধারণ সম্মেলনসমূহে। সূরা তওবার তৃতীয় আয়াতে কথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ

اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر الاية

আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও, যদি তোমরা তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ তোমরা আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না, আর এই কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

চুক্তি বাতিলের খোলা প্রচার ও হুঁশিয়ারি দান ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরোক্ত আদেশ পালন উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) নবম হিজরীর হজ্ব মৌসুমে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করে আরাফাতের মাঠ ও মিনাপ্রান্তরে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর সম্মেলনে আল্লাহ্‌র ঘোষণাটি প্রচার করেন। এ বিরাট সম্মেলনে যে কথা প্রচারিত হয়, তা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যায়। এ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা)-র মাধ্যমে ইয়ামনে তা পুনঃ প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এ সাধারণ ঘোষণার পর প্রথম শ্রেণীভুক্ত মক্কার মুশরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ মাসগুলোর শেষ অর্থাৎ দশম হিজরীর মহররম মাস, দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে একই হিজরীর রমযান মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষে উক্ত হিজরীর রবিউস্‌সানী গত হলে আরবভূমি ত্যাগ করার বিধান ছিল। নতুবা; তারা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ আদেশ অনুযায়ী হজ্বের আগামী মৌসুমে আরবের সীমানায় কোন কাফির মুশরিকের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না---একথাটি সূরা তওবার ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ২৮তম আয়াতে ব্যক্ত করা হয় এরূপে অর্থাৎ চলতি মাসের পর এরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস لا يحجن بعد العام مشرك "এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্ব করবে না" এর মর্মার্থও তাই। এ পর্যন্ত সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতের তফসীর ঘটনাবলীর আলোকে বর্ণিত হল।

উক্ত আয়াতসমূহের আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ প্রথম রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কোরাইশ ও অপরাপর শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের সাথে ক্ষমা মার্জনা ও দয়া-মায়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষা দেন যে, যখন তোমাদের কোন শত্রু তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তার থেকে বিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেবে না, বরং তাকে ক্ষমা করে ইসলামী আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। শত্রুর সাথে ক্ষমার আচরণে যদিও মন সায় দেয় না, তথাপি এতে লুকায়িত আছে বড় ধরনের কতিপয় মঙ্গল। এ মঙ্গল প্রথমে নিজের জন্য। কারণ, প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে নফসের আনন্দ থাকলেও তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যে উচ্চ দরজা লাভ করা যায় তা স্থায়ী, এর মূল্যও অসীম। স্থায়ীকে ক্ষণস্থায়ীর ওপর প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বিতীয়ঃ শত্রুকে কাবু করার পর নিজের রাগ সংবরণ একথা প্রমাণ করে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং তা শুধু আল্লাহ্র জন্য। এই মহান উদ্দেশ্য ইসলামী জিহাদ ও ফাসাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়ার বুকে তাঁর শাসন জারি করার জন্য যে যুদ্ধ, তার নাম জিহাদ, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই ফাসাদ।

তৃতীয়ঃ শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর সে যদি মুসলমানদের ক্ষমা-মার্জনার এ অনুপম আদর্শ প্রত্যক্ষ করে তবে সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও মুসলমানদের ভাল বাসবে। আর এ ভালবাসা দেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা, যা হবে তার জন্য সফলতার চাবিকাঠি। মূলত এটিই জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্ষমা করার অর্থ নিরাপত্তাবিহীন হওয়া নয়ঃ দ্বিতীয় যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হল, ক্ষমা-মার্জনার অর্থ এই নয় যে, শত্রুকে শত্রুতার সুযোগ দেবে এবং নিজের জন্য নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেবে না। বরং বিচক্ষণতা হল, ক্ষমা-মার্জনার সাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও শত্রুতার সকল ছিদ্র বন্ধকরণ। এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) বড় হিকমতপূর্ণ ইরশাদ করেছেন ঃ لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين "বুদ্ধিমান মানুষ এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।" নবম হিজরী সালে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদ ঘোষণা এবং হারম শরীফের সীমানা ত্যাগের জন্য তাদের সময় এ সুযোগদান উপরোক্ত প্রজ্ঞাসম্মত কার্যক্রমের প্রমাণ বহন করে। তৃতীয় বিষয় হল, সময় ও সুযোগ দান ব্যতীত দুর্বল মানুষের প্রতি হঠাৎ দেশ ত্যাগের আদেশ দেওয়া কাপুরুষতা ও চরম অভদ্রতা। তাই কাউকে

দেশ ত্যাগের আদেশ দিতে গেলে প্রথমে তার প্রচার আবশ্যক এবং তাকে সময় ও সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সে আমাদের আইন-কানুন মেনে নিতে রাযী না হলে যেখানে ইচ্ছা সহজে চলে যেতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত নবম হিজরীর সাধারণ ঘোষণা এবং সকল শ্রেণীকে সময় দানের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

চতুর্থ ঃ কোন জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে তা বাতিল অবশ্য করা যায়, কিন্তু উত্তম হল চুক্তি তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত পালন করে যাওয়া যেমন সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তি নয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম ঃ শত্রুদের সাথে প্রতিটি আচরণ মনে রাখতে হবে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, শত্রুতা তাদের সেই কুফরী আকীদা বিশ্বাসের সাথে, যা তাদের ইহ-পরকাল ধ্বংসের কারণ। বস্তুত এর মূলে রয়েছে তাদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তাই যুদ্ধ বা সন্ধির যে কোন অবস্থায় সহানুভূতিভাব ত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন এ সকল আয়াতে বারংবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য উভয় জাহানে কল্যাণকর। কিন্তু তওবা করা না হলে শুধু দুনিয়ায় নিহত ও ধ্বংস হবে—যাকে বহু কাফির জাতি কৃতিত্ব হিসাবেও গ্রহণ করে নেয়—তা নয়; বরং নিহত হওয়ার পর পরকালীন আযাব থেকেও নিস্তার পাবে না। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সতর্কতার ঘোষণার সাথে নসীহত ও হিতাকাঙ্ক্ষারও আমেজ রয়েছে।

ষষ্ঠ ঃ চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি যেমন মেয়াদকাল পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি পালনের আদেশ রয়েছে, তেমনি তার শেষ ভাগে রয়েছে ঃ ان الله يحب المتقين 'আল্লাহ্ অবশ্যই সাবধানীদের পছন্দ করেন।' এতে চুক্তি পালনে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির মত তোমরা ছলে-বলে-কৌশলে যেন চুক্তি ভঙ্গের পাঁয়তারা না কর।

সপ্তম ঃ পঞ্চম আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সঠিক উদ্দেশ্যে কোন জাতির সাথে জিহাদ আরম্ভ হলে তাদের মুকাবিলায় নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক তখন দয়া-বাসনা বা নম্রতা হবে কাপুরুষতার নামান্তর।

অষ্টম ঃ পঞ্চম আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন অমুসলমানের ইসলাম গ্রহণকে তিন শর্তে স্বীকৃতি দেয়া যায়। প্রথম তওবা, দ্বিতীয় নামায কায়েম, তৃতীয় যাকাত আদায়। এ তিন শর্ত যথাযথ পূরণ না হলে নিছক কলেমা পাঠে যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাবে না। রসূলে করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবাদের সামনে এ আয়াতটি পেশ করে তাঁদের ইতস্তত ভাব দূর করেন।

নবম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত يوم الحج الاكبر -এর অর্থ নিয়ে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), হযরত উমর ফারূক (রা), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবা বলেন ঃ يوم الحج الاكبر -এর অর্থ আরাফাতের দিন। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন الحج عرفة 'হজ্ব হল আরাফাতের দিন'---(আবূ দাউদ)। আর কেউ বলেন, এর অর্থ কুরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্ব।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) এবং অপরাপর ইমাম এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে বলেন, হজ্বের পাঁচ দিন হল হজ্বে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يوم (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يوم الفرقان রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يوم احد يوم بعاث প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। অনেক দিন ব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হল হজ্বে আসগর বা ছোট হজ্ব। এর থেকে হজ্বকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজ্বে-আকবর অর্থাৎ বড় হজ্ব। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজ্বকে হজ্বে-আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্ব হল হজ্বে-আকবর---তাদের ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হযরত (সা)-এর বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্‌সাস (র) 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন, হজ্বের দিনগুলোকে 'হজ্বে-আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাস'আলাটি বের হয় যে, হজ্বের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা, কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্বে-আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝٦
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٨﴾ اِشْتَرَوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ
وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

(৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়, অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্য যে এরা জ্ঞান রাখে না। (৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্র নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতপর যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৮) কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতপর লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্যি তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মুশরিকদের কেউ যদি (মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হত্যার বৈধ সময়ে তওবা ও ইসলামের ফযীলত এবং মাহাত্ম্য শুনে তৎপ্রতি উৎসাহিত হয় এবং ইসলামের সত্যতা ও স্বরূপ অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে) তোমার কাছে (এসে) আশ্রয় প্রার্থনা করে (যাতে পরিতৃপ্তির সাথে শুনতে ও অনুধাবন করতে পারে) তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম (অর্থাৎ সত্য দীনের প্রমাণপঞ্জি) শুনতে পারে। অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে (অর্থাৎ তাকে যেতে দেবে, যাতে সে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এরূপ আশ্রয় দানের) এ (আদেশ)-টি এজন্যে যে এরা (পূর্ণ) জ্ঞান রাখে না (তাই তাদের কিছু সুযোগ দেয়া আবশ্যক। ওদিকে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাদের চুক্তি ভঙ্গের আগেই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে আল্লাহ্ বলেন,) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবেঃ (কারণ, বলবৎ থাকার জন্য অপর পক্ষকেও অবিচল থাকা দরকার। সারকথা, এরা চুক্তিলংঘন অবশ্যই করবে। তখন আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকেও কোন অনুকম্পা পাবে না) তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারাম (হারম শরীফ)-এর নিকট (এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যাদের উল্লেখ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ আয়াতে এসেছে, এদের প্রতি আশা রাখা হয় যে, এরা চুক্তির উপর বহাল থাকবে), অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে (চুক্তি ভঙ্গ না করে), তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। (এবং মেয়াদকাল পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। উল্লেখ্য, সূরা 'বরাআত' নাযিল হওয়ার সময় মেয়াদকাল আরও নয় মাস বাকি ছিল। তাই তাদের চুক্তি রক্ষার ফলে মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করা হয়) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (চুক্তি ভঙ্গ হতে) সাবধানী লোকদের পছন্দ করেন (তাই তোমরাও সাবধানতা অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হতে পার। দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা এখানে শেষ করে পরবর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর অবশিষ্ট বিষয় বর্ণিত হচ্ছে)। (৮) কিরূপে? (তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। কারণ, তাদের এ চুক্তি তো পারতপক্ষে, যুদ্ধের ভয়ে; অন্তরের সাথে নয়, তাই তারা) মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে (সুতরাং চুক্তি পালনের ইচ্ছাই যখন তাদের অন্তরে নেই, তখন তা কেমন করে পূর্ণ হবে।) আর তাদের অধিকাংশ অবাধ্য (এজন্য এরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় না। এক-আধটি রক্ষা করতে চাইলেও অধিকাংশের তুলনায় তা ধর্তব্য নয়, তাদের এই দুষ্ট প্রকৃতির কারণ হল) (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর বিনিময়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ তালাশ করে।) যেমন (কাফিরদের অবস্থা, এরা ধর্মের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় আর যখন দুনিয়াই এদের প্রিয়, তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে পার্থিব উপকার পরিদৃষ্ট হলে, চুক্তিভঙ্গের সংকোচ আর থাকে না। পক্ষান্তরে দুনিয়ার উপর যারা ধর্মকে প্রাধান্য দেয়, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে)

অতপর (ওরা দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দেয়ার ফলে) লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর (আল্লাহ্‌র) সরল পথ থেকে (প্রতিশ্রুতি রক্ষাও এর শামিল।) তারা যা করে চলছে, তা কতই না নিকৃষ্ট! (আর, তারা যে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না বললাম, তা শুধু তোমাদের বেলায় নয়; বরং তাদের চরিত্র হল,) (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানদের ক্ষেত্রে (-ও) আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের. আর তারা (বিশেষত এ ক্ষেত্রে) অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্য (যখন তাদের প্রতিশ্রুতি ভরসাযোগ্য নয়; বরং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, যেমন সম্ভাবনা আছে প্রতিশ্রুতি রক্ষারও। তাই তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান দিচ্ছি যে) তারা যদি (কুফরী থেকে) তওবা করে (ইসলাম গ্রহণ করে,) এবং (কাজেকর্মে ইসলামকে প্রকাশ করে, যেমন) নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তা'হলে (তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে, তারা যাই করুক না কেন? মোট কথা, ইসলাম গ্রহণের ফলে) তারা তোমাদের দীনী ভাই (এবং তাদের সকল অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে), আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের (বলার) জন্যে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি (সুতরাং এখানেও তাই করা হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফির-মুশরিকের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভংগ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবাধ চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে, তাদের চারমাসের দীর্ঘ সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা হয় আরামের সাথে যেতে পারে অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহ্‌র এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মংগল লাভের দরজা খোলা হয়। ষষ্ঠ আয়াতে একথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে। যার সারবস্তু হল, হে রসূল, মুশরিকদের কেউ আপনার আশ্রয় নিতে চাইলে তাকে আশ্রয় দেয়া দরকার। এতে সে আপনার নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে ও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। তাকে শুধু সাময়িক আশ্রয় দেওয়া নয়; বরং যথার্থ নিরাপত্তার সাথে তাকে তার নিরাপত্তা স্থানে পৌঁছে দেয়াও মুসল-

মানদের কর্তব্য। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয় যে, এ আদেশ এজন্য যে এরা পূর্ণ জ্ঞান রাখে না, তাই আপনার পাশে থাকলে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র) এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসায়েল ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে তুলে ধরছি।

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলিমদের কর্তব্য ঃ প্রথমত, আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল তলব করে, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে ঃ এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহ্‌র কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকদের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না ঃ তৃতীয়ত, বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ, এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান ও অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حتى يسمع كلم الله অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত, মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চার আয়াতে প্রথম আয়াতের সম্পর্কছেদ ঘোষণার কিছু কারণ দর্শানো হয়। এতে মুশরিকদের দুষ্ট প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা বাতুলতা মাত্র। তবে মসজিদুল-হারামের পাশে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ও রসূলের দৃষ্টিতে ওদের অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, যারা একটু সুযোগ পেলেই প্রতিশ্রুতি বা আত্মীয়তা কোনটিরই ধার ধারবে না। কারণ, চুক্তি সই করলেও চুক্তি পালনের কোন ইচ্ছা তাদের অন্তরে নেই। তারা শুধু মুখের ভাষায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক।

সদা ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা ঃ কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায়

যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণত এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি, এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশবশত এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয়ঃ واكثرهم فاسقون "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী" অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছেঃ ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا "কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে"। ---(মায়েদাহ)।

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্ম-পীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুঁশিয়ার করা হয় যে, এরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল দুনিয়াপ্রীতি। মূলত দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহ্র আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পুঁতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয়ঃ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তা নয়; বরং তারা যে কোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হিদায়ত দেয়ঃ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم في الدين ---তবে তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফিররা যত শত্রুতা করুক, যত

নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ্ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবি পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের তিন শর্ত ঃ এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ, ঈমান ও তওবা হল গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয় ; নামায ও যাকাত।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রা) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য ; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্র ধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কিরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন।---(ইবনে কাসীর)

একাদশ আয়াতের শেষ বাক্যে চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় ঃ **و نفصل الا يت لقو م يعلمون** "আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ
فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾
اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ
وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ
تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ
وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ

اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا
رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

(১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্—যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তার রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ (যেমন তাদের অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়) অঙ্গীকার করার পর এবং ঈমান না আনে; বরং কুফরী মতের উপর দৃঢ় থাকে। (যার ফলে) বিদ্রূপ (ও আপত্তি প্রকাশ) করে তোমাদের দীন (ইসলাম) সম্পর্কে, তবে (এমতাবস্থায়) তাদের কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করে। কারণ, (এ অবস্থায়) তাদের কোন শপথ (বাকি) নেই। (এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর) যাতে তারা (কুফরী থেকে) ফিরে আসে। (১৩) (এ পর্যন্ত তাদের চুক্তিভঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করা হল। পরবর্তী আয়াতে চুক্তিভঙ্গের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উৎসাহ দিয়ে বলা হয়) তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না কেন, যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ (এবং বনূ বকর গোত্রের বিরুদ্ধে বনূ খোযাআ গোত্রকে সাহায্য করেছে) আর সংকল্প নিয়েছে রসূল (সা)-কে (দেশ থেকে বহিষ্কারের। আর এরাই প্রথমে তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে) অথচ তোমরা চুক্তি পালন করে চলছ আর তারা বসে বসে পাঁয়তারা আঁটছে। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না কেন?) তোমরা কি তাদের (সাথে যুদ্ধ করতে) ভয় কর? (যে এরা দলে ভারী! যদি তাই হয়, তবে তাদের ভয় করার কিছু নেই। কেননা) তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মু'মিন হও। (আল্লাহ্র

ভয় যদি রাখ, তবে তাঁর বিরোধিতা করবে না। তিনি এক্ষণে তোমাদের প্রতি যুদ্ধের হুকুম দিচ্ছেন। তাই) যুদ্ধ কর তাদের সাথে আল্লাহ্ (প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে,) তোমাদের দ্বারা তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত (ও অপদস্থ) করবেন। তাদের উপর তোমাদের জয়ী করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি ও তোমাদেরকে সাহায্যদানের দ্বারা (সেই) মুসলমানদের অন্তর শান্ত করবেন (১৫) ও তাদের মনের খুঁত দূর করবেন যাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই, কিন্তু অন্তর জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত আর আল্লাহ্ (সেই কাফিরদের থেকে) যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের তওফীক দেবেন। যেমন মক্কা বিজয়কালে এদের কেউ কেউ অস্ত্রধারণ করে এবং নিহত ও লাঞ্ছিত হয়, আর কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে) আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (নিজের জ্ঞান দ্বারা মানুষের পরিণতি কি ইসলাম, না কুফর তা'ও জানেন। সে জন্য নিজের প্রজ্ঞামতে অবস্থানুসারে বিধান প্রবর্তন করেন।) আর তোমরা (যারা যুদ্ধকে ভয় কর) কি মনে কর যে তোমাদের (এমনিতে) ছেড়ে দেওয়া হবে? যতক্ষণ না আল্লাহ্ (প্রকাশ্যে) জেনে নেবেন, তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে (প্রকাশ্যে জানার মওকা হল এমন যুদ্ধ, যে যুদ্ধে অংশ নিতে হয় আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে। তাই পরীক্ষা হয়ে যায় কে আল্লাহ্কে চায় এবং কে আত্মীয়-স্বজনকে চায়) আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (অতএব, তোমরা যুদ্ধে তৎপর হও বা অলস হয়ে বসে থাক, আল্লাহ্ সে অনুপাতেই তোমাদের বদলা দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় মক্কার যে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়ঃ وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فقاتلوهم লক্ষণীয় যে, এখানে আপাত দৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর'। কিন্তু তা না বলে বলা হয়ঃ فقاتلوا ائمة الكفر 'সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।' তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কোরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। তা'ছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো।—(মাযহারী)

যিম্মীদের বিদ্রূপ অসহ্য ঃ وطعنوا فى دينكم "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলিম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ-বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম যিম্মীদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হল ঃ انهم لا ايمان لهم অর্থাৎ 'এদের কোন শপথ নেই; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্যমান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হল ঃ لعلهم ينتهون 'যাতে তারা ফিরে আসে।' এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

অতপর ত্রয়োদশ আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়, তোমরা সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না কেন, যারা তোমাদের নবীকে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে? এরা হল মদীনার ইহুদী অধিবাসী। এদের সদম্ভ ঘোষণা يخرجن الاعز منها الاذل "সম্মানী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অবশ্যই মদীনা থেকে নীচু লোকদের বহিষ্কার করবে"। এদের দৃষ্টিতে সম্মানী লোক হল তারা আর

নীচু ও দুর্বল লোক হল মুসলমান! যার পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরই দম্ভোক্তিকে অচিরে এভাবে সত্য করে দেখান যে, রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা মদীনা থেকে ইহুদীদের সমূলে উৎখাত করেন। এতে দেখান হয় যে, সম্মানী ও শক্তিবান হল মুসলমান এবং নীচু প্রকৃতির হল ইহুদীরা।

وهم بدءوكم أول مرة 'তারাই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেছে' বাক্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ বিবাদের সূত্রপাত যখন তারা করেছে, তখন তোমাদের কাজ হবে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলা। আর এটি সুস্থ বিবেকেরই দাবি।

এর পর মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফিরদের ডর-ভয় দূর করার জন্য বলা হয়েছে ঃ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যাঁর আযাব রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পরিশেষে ان كنتم مؤمنين যদি তোমরা মু'মিন হও' বাক্য সংযোজন করে বলা হয় যে, শরীয়তের হুকুম তা'মিলে বাধা হয়—গায়রুল্লাহ্র এমন ভয় অন্তরে স্থান দেওয়া মুসলমানদের শান নয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে ভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের প্রতি জিহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এতে কতিপয় জানার বিষয় রয়েছে।

প্রথমত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যই এসে পড়বে, আর এই কাফির জাতি নিজেদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত তাদের উপর আসমান বা যমীন থেকে আল্লাহ্র আযাব আসবে না; বরং يعذبهم الله بايديكم তোমাদের হস্তেই আল্লাহ্ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অন্তর থেকে সে সমুদয় চিন্তা-ক্লেশ দূর করবেন, যা কাফিরদের দ্বারা প্রতিনিয়ত পৌঁছুচ্ছিল।

তৃতীয়ত, কাফিরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমানদের মনে যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আল্লাহ্ তা প্রশমিত করবেন তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে।

পূর্ববর্তী আয়াতে لعلهم ينتهون যাতে তারা ফিরে আসে, বাক্য দ্বারা মুসলমানদের হিদায়েত করা হয় যে, নিছক প্রতিশোধের নেশার উদ্দেশ্যে যেন কোন জাতির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়; বরং উদ্দেশ্য হবে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সৎপথ প্রদর্শন। আর এ আয়াতে বলা হয় যে, মুসলমানেরা যদি নিজেদের নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য শুদ্ধ করে নেয় এবং শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে যুদ্ধ করে, তবে আল্লাহ্ নিজগুণে তাদের ক্রোধ প্রশমনের কোন ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থঃ আয়াতে একটি বাক্য হল, ويتوب الله على من يشاء "আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। অর্থাৎ তাদের তওবা কবূল করবেন। এ বাক্য দ্বারা জিহাদের আর একটি উপকার প্রতীয়মান হয়। তা'হল শত্রু দলের অনেকের ইসলাম গ্রহণের তওফীক হবে এবং তারা মুসলমান হবে। তাই দেখা যায়, মক্কা বিজয়কালে সেখানে অনেক দুষ্ট কাফির লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যেসকল অবস্থা ও ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একের পর এক সকল ঘটনা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এ আয়াতগুলো বহু মু'জিযাসম্বলিত রয়েছে, সন্দেহ নেই।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ښ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝
اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

(১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্‌র মসজিদ (যার মধ্যে মসজিদুল-হারাম অন্তর্ভুক্ত) আবাদ করার, যে অবস্থায় তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরী কার্য-কলাপের স্বীকৃতি দিচ্ছে। (যেমন তারা নিজেদের মতাদর্শ প্রকাশকালে এমন আকায়েদ ব্যক্ত করে যা প্রকৃতপক্ষে কুফর। সার কথা, মসজিদ আবাদ করা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। কিন্তু শিরক এই উত্তম কাজের বিপরীত বিধায় তাদের মসজিদ আবাদ করার মত উত্তম কাজের যোগ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেজন্য তাদের একাজের কোনই

মূল্য নেই, গর্ববোধের প্রশ্ন তো আসেই না) এদের (মুশরিকদের) আমল (মসজিদ নির্মাণ প্রভৃতি) বরবাদ (নিস্ফল। কারণ, কবুলিয়তের শর্ত অনুপস্থিত। তাই বেকার আমলের গর্ব বৃথা) এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (কেননা, যে আমলগুলো নাজাতের উসিলা তা তো বরবাদই হয়ে গেল)। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করবে (এবং তাদের এ আমল কবুল হওয়ার যোগ্যতাও পূর্ণ রাখে যারা ঈমান এনেছে (অন্তরের সাথে) আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশ করে। যেমন,) নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, আর (আল্লাহ্‌র প্রতি এমন ভরসা রাখে যে,) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া) যায় তারা হিদায়েত (জান্নাত ও নাজাত) প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (যেহেতু তাদের আমল ঈমানের বরকতে কবুলযোগ্য, সেহেতু পরজীবনে এর উপকার পাবে। পক্ষান্তরে ঈমানের বরকত থেকে মুশরিকদের আমল শূন্য। তাই পরকালীন উপকার থেকে তারা বঞ্চিত। আর বেকার আমলের গর্ব হল অসার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবি শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্যে দেখতে চান কারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অমুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত ঃ প্রথম, শুধু আল্লাহ্‌র জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয় ঃ **والله خبير بما تعملون** "আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না।

এ বিষয়টি কোরআনের অপর আয়াতে এরূপে ব্যক্ত হয়ঃ **احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا أمنا وهم لا يفتنون** অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করে যে, ঈমানের দাবি করার পর কোন পরীক্ষায় নিপতিত করা ব্যতীত তাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?"

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয়ঃ ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ **وليجة** এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে **بطانة** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হলঃ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, মু'মিনদের ব্যতীত, আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত কর না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোন ত্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুল যোগ্য তরীকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হলঃ

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত মুশরিকদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আপাত-দৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম তো পবিত্র, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও মুশরিকদের নিরাপত্তা বিধানে তারা এখনো বাতিল তরীকায় হারাম শরীফে তওয়াফ ও উপাসনা করে চলে।

অথচ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, যেরূপ মূর্তি থেকে হারাম শরীফকে পবিত্র করা হয়, সেরূপ মূর্তিপূজা ও অন্য সকল বাতিল উপাসনা থেকেও পবিত্র করা। এ উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশ বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা হতো সাধারণ ক্ষমার বরখেলাফ। যার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাই ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হল। তবে মক্কা বিজয়ের পরের বছর রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা)-র দ্বারা মিনা ও আরাফাতের সমাবেশে ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে হারাম শরীফে মুশরেকী তরীকায় কোন ইবাদত-উপাসনা এবং হজ্জ ও তওয়াফের অনুমতি থাকবে না। জাহেলী যুগে কা'বা শরীফে উলঙ্গ তওয়াফের যে ঘৃণ্য প্রথা চলে আসছে আগামীতে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। হযরত আলী (রা) মিনার সমাবেশে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণাটি প্রচার করেনঃ **لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان** অর্থাৎ "চলতি বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে পারবে না।"

এক বছরের এই যে সময় দেওয়া হল, তার কারণ, এদের মধ্যে আছে এমন অনেকে, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি সাধিত হয় এবং এরা চুক্তি পালন করেও চলছে। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন কোন আইন পালনে বাধ্য করা ইসলামী উদারনীতির খেলাফ। এজন্য এক বছর আগেই ঘোষণা করা হয় যে, হারাম শরীফকে মুশরেকী তরীকায় ইবাদত, উপাসনা ও আচার-প্রথা থেকে পবিত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, এ ধরনের ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইবাদত নয় এবং এর দ্বারা মসজিদ আবাদ করা হল বিরান করার নামান্তর।

মক্কার মুশরিকগণ শিরকী আচার-অনুষ্ঠানকে ইবাদত ও মসজিদুল হারামের হিফাযত ও আবাদ রাখার মাধ্যম মনে করত। আর এ জন্য তাদের গর্বেরও অন্ত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, একমাত্র তারাই বায়তুল্লাহ্‌র ও মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ও হিফাযতকর্তা। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমার পিতা আব্বাস যখন ইসলাম গ্রহণের আগে বদর যুদ্ধ চলাকালে বন্দী হন এবং মুসলমানরা তাঁর মত বুদ্ধিমান লোককে কুফর ও শিরকের উপর অবিচল থাকার জন্য বিদ্রূপ ও লজ্জা দান করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ দিকগুলো দেখ ভালগুলো দেখ না। তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরাই তো বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামকে আবাদ রেখেছি এবং এর যাবতীয় ইন্তেযাম তথা হাজীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি রয়েছে আমাদের দায়িত্বে। তাই আমরাই এর মুতাওয়াল্লী। এ দাবির প্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াতগুলো নাযিল হয়ঃ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله অর্থাৎ "মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ত নয়।" কারণ, মসজিদ নির্মিত হয় শুধু লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। কুফর ও শিরকের সাথে রয়েছে এ উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব। তাই এটা মসজিদ আবাদের উপকরণ হতে পারে না। মসজিদের তা'মীর বা আবাদ করার একাধিক অর্থ রয়েছে। প্রথম, গৃহ নির্মাণ। দ্বিতীয়, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। তৃতীয়, ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিতি। 'ইমারত' থেকে ওমরা শব্দের উৎপত্তি। ওমরা পালনকালে 'বায়তুল্লাহ্'র যিয়ারত ও তথায় ইবাদতের জন্য উপস্থিত হতে হয়।

মক্কার মুশরিকরা এই তিন অর্থে নিজেদেরকে বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামের আবাদকারী মনে করত এবং এতে তাদের গর্ব ছিল প্রচুর। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দাবি নাকচ করে বলেন যে, কুফর ও শিরকের ওপর তাদের স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় থাকার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার কোন অধিকার তাদের নেই বরং এ বিষয়ে তারা অনুপযুক্ত। এ কারণে তাদের আমলগুলো নিষ্ফল এবং তাদের স্থায়ী বসবাস হবে জাহান্নামে।

কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি কথাটির এক অর্থ হল, তারা শিরক ও কুফরী কার্যকলাপের দ্বারা তার স্বীকৃতি দিচ্ছে। অপর অর্থ হলো, কোন খৃস্টান বা ইহুদীর পরিচয় চাওয়া হলে তারা নিজেদের খৃস্টান বা ইহুদী বলে পরিচয় দেয়। অনুরূপ, অগ্নি উপাসক

ও মূর্তিপূজকদের পরিচয় চাওয়া হলে নিজেদের কুফরী নামের দ্বারা পরিচয় প্রদান করে। এটিই হল তাদের কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি।----(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মসজিদ আবাদকরণে কাফিরদের অনুপযুক্ততা এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের উপযুক্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। এর তফসীর হল, মসজিদের প্রকৃত আবাদ তাদের দ্বারা সম্ভব, যারা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে হুকুমে ইলাহীর অনুগত। যাদের পাকাপোক্ত বিশ্বাস রয়েছে আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি। যারা নিয়মিত নামাযের পাবন্দী করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় অন্তরে স্থান দেয় না।

এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রোজ-কিয়ামতের উল্লেখ করা হল মাত্র। রসূলের উল্লেখ এ জন্য করা হল না যে, রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনীত শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়, ঈমান-বির-রসূল, 'ঈমান-বিল্লাহ'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা বোঝানোর জন্যই একদিন হুযূর (সা) সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। হুযূর (সা) বলেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ হল, মানুষ অন্তরের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান-বির-রসূল 'ঈমান-বিল্লাহ'-এ শামিল রয়েছে।---(মাযহারী)

"আল্লাহ্কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না" বাক্যের মর্ম হল কারো ভয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালন থেকে বিরত না থাকা। নতুবা, প্রত্যেক ভয়ঙ্কর বস্তুকে ভয় করা তো মানুষের স্বভাব। এজন্যই হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সর্প ও চোর-ডাকাত প্রভৃতিকে মানুষ ভয় করে। হযরত মূসা (আ)-র সামনে যখন যাদুকরেরা রশিগুলোকে সর্পে পরিণত করে, তখন তিনিও ভীত হন। তাই কষ্টদায়ক বস্তুগুলোর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভয় উপরোক্ত কোরআনী আদেশের পরিপন্থী নয় এবং তা রিসালত বিরোধীও নয়। তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালনে বিরত থাকা মু'মিনের শান নয়। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

কতিপয় মাসায়েল ঃ আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফিরদের নেই। অর্থ হল, কাফিররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন কাফিরকে কোন ইসলামী ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণ কাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই।---(তফসীরে মুরাগী)

কোন অমুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয় তবে কোন প্রকার দীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি উহার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে।--- (শামী)

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্মত নেক্‌কার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হিফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকির বা দীনী ইলমের শিক্ষা দানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামিল মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ انما يعمر مسجد الله من امن بالله "আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ----------।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে ; নবীয়ে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর জন্যে জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন।" হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা।"---(মাযহারী, তাবরানী, ইবনে জারীর ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি)।

কাযী সানাউল্লাহ পানীপথি (র) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ কারার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ।---(মাযহারী)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۙ أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَتَّخِذُوٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়েত করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে আর তারাই সফলকাম। (২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরোয়ারদিগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইয়ের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের (আমলের) সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে (তার সে আমল হল ঈমান ও জিহাদ। এ দু'টি অন্য আমলের সমান হতে পারে না। তাই) এরা (যারা এ আমলের অধিকারী) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়। (সার কথা, এক আমল অপর আমলের এবং এক আমলকারী অপর আমলকারীর সমান নয়। ঈমান ও জিহাদ এ দু'টির যে কোনটিই পানি সরবরাহ ও মসজিদ আবাদকরণ থেকে আফযল আমল। এ থেকে বোঝা যায় ঈমান এ দু'টি থেকে আফযল। এতে রয়েছে মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর। কারণ, তাদের ঈমান নেই। আর জিহাদও যে উপরোক্ত দু'কাজ থেকে আফযল সে কথাও বোঝা গেল। তাই এতে রয়েছে সে সকল মু'মিনের প্রশ্নের উত্তর, যারা ঈমানের পর পানি সরবরাহ ও মসজিদ আবাদ করাকে জিহাদের চেয়ে আফযল মনে করত)। আর (উপরোক্ত কথাটি স্বতন্ত্র। কিন্তু) আল্লাহ্ জালিম লোকদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) হিদায়েত করেন না। (ফলে তারা সত্য উপলব্ধি করে না। অথচ, ঈমানদাররা অবিলম্বে তা মেনে নিয়েছে। সামনে উপরোক্ত দুই বিপরীত আমল সমান না হওয়ার আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছেঃ) যারা ঈমান এনেছে, (আল্লাহ্র জন্য) দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করেছে মাল ও জান দিয়ে, (পানি সরবরাহকারী ও মসজিদ আবাদকারী অপেক্ষা) তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। (কারণ, পানি সরবরাহকারী ও মসজিদ আবাদ-

কারীরা যদি ঈমান-শূন্য হয়, তবে এ শ্রেষ্ঠত্ব দেশত্যাগী মু'মিন ও জিহাদকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে! আর যদি তারা ঈমানদার হয়, তবেও দেশত্যাগী মু'মিন যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠত্ব সবার উর্ধ্বে থাকবে) আর এরাই সফলকাম (কেননা, এদের প্রতিপক্ষ যদি ঈমানশূন্য হয়, তবে সফলতা এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর যদি ঈমানদার হয়, তবে উভয়কে সফলকাম অবশ্যি বল যায়, কিন্তু এদের সফলতা সর্বোচ্চে। সামনে সফলতার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে,) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরোয়ারদিগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের (এমন বাগ-বাগিচার) যেখানে আছে তাদের জন্য স্বীয় শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহা পুরস্কার (যা তাদের প্রদান করা হবে)। হে ঈমানদারগণ, তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না যদি তারা কুফরকে ঈমান অপেক্ষা (এমন) ভালবাসে (যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে না)। আর তোমাদের যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা সীমালংঘনকারী। (মোট কথা এসবের সম্পর্কই হল হিজরতের সাথে। বস্তুত হিজরতের মাধ্যমে বড় বাধাই যখন নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন আর হিজরত কঠিন হতে পারে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা' হল মক্কার অনেক কুরাইশ মুসলমানদের মুকাবিলায় গর্ব সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর ওপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রা) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন, এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মের ওপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

মাস্‌নাদে আবদুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবী আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরেও রাত যাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস বলেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রা) অতপর বলেন, বুঝতে পারি না এগুলোর ওপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে রুখ করে নামায আদায়

করেছি এবং রসূলুল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। তাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল —তা যতই বড় হোক—আল্লাহ্‌র কছে কোন মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুম'আর দিন তিনি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মুকাবিলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত উমর ফারূক (রা) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্‌র মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুম'আর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথা মত প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ওপর জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদেরও অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এসকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

সে যা হোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবূলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মুকাবিলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যন্ত ভূমিকার পর উল্লিখিত আয়াতের শব্দ ও অর্থের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। ইরশাদ হয় ঃ

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে সেই লোকের (আমলের) সমান মনে কর যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ্‌ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি এবং সে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে। এরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়।"

পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা আয়াতের এ উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায় যে, ঈমান ও জিহাদ উভয়েই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি সরবরাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে মুশরিকের অসার দাবির খণ্ডন রয়েছে। আর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুসলমানদের সেই ধারণার বিলোপ সাধন করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহকে জিহাদের চাইতেও পুণ্যকাজ মনে করত।

আল্লাহ্‌র যিকির জিহাদের চেয়ে পুণ্যকাজ ঃ তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানা-উল্লা পানিপথী (র) বলেন, এ আয়াতে মসজিদ আবাদ করার ওপর জিহাদের যে ফযীলত রয়েছে তা তার যাহেরী অর্থানুসারে। অর্থাৎ মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবে তার চাইতে জিহাদের ফযীলত স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি ইবাদত ও আল্লাহ্‌র যিকির উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনাগমন হয় আর এটিই হল মসজিদের প্রকৃত আবাদকরণ—তবে রসূলে করীম (সা)-এর স্পষ্ট হাদীসের আলোকে তা হবে জিহাদের চাইতেও আফযল, উত্তম কাজ। যেমন—মাসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেব, যা তোমাদের অন্যান্য আমল থেকে উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী এবং যা আল্লাহ্‌র রাহে সোনা-রূপা দান করার চাইতেও আফযল (উত্তম), এমনকি সেই জিহাদের চাইতেও আফযল, যেখানে তোমরা শত্রুর সাথে শক্ত মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে এবং তোমরা তাদেরকে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, তা অবশ্যই বলবেন। হযরত (সা) বলেন, তা হল আল্লাহ্‌র যিকির। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যিকিরের ফযীলত জিহাদের চাইতেও বেশি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদের অর্থ যদি যিকিরুল্লাহ নেওয়া হয় তবে তা জিহাদ থেকে আফযল হবে। কিন্তু এখানে মুশরিকদের গর্ব অহংকার যিকির ও ইবাদতের ভিত্তিতে ছিল না বরং তা ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে। তাই আয়াতে জিহাদকে অধিক ফযীলতের কাজ বলে অভিহিত করা হয়।

তবে কোরআন ও হাদীসের সম্মিলিত আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থার তারতম্যে আমলের ফযীলতেও তারতম্য ঘটে। এক অবস্থায় কোন বিশেষ আমল অপর আমলের চাইতে অধিক পুণ্যের হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তা লঘু আমলে পরিণত হয়। যে অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষা যুদ্ধের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, সে অবস্থায় জিহাদ নিঃসন্দেহে সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রসূলে করীম (সা)-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। আর যখন যুদ্ধের এমন প্রয়োজন থাকে না তখন আল্লাহ্‌র যিকির হবে জিহাদের তুলনায় অধিক ফযীলতসম্পন্ন ইবাদত।

আয়াতের শেষ বাক্য হল وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও

সকল ইবাদত থেকে আফযল এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়েত ও উপলব্ধি-শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার ওপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لا يستون 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ইরশাদ হয়ঃ الذين امنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله الاية "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।" পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানরা এ সফলতার অংশীদার কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদদের সফলতা সবার ঊর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা।

২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়ঃ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت الاية তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরোক্ত আয়াতে হিযরত ও জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয়ঃ يايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم الاية "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ কর না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমা লংঘনকারী।"

মাতা-পিতা-ভাই-ভগ্নি এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক, তা মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এই দুই সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রথমত ঈমান হল আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের

মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখিরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ্ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফিরদের নিষ্প্রাণ নেক আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ গোনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য ঃ ان الله لا يهدى القوم الظلمين "আল্লাহ্ জালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়ঃ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি ভালমন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া পরহিযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালমন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয়ঃ নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলুকের শুরুতে আছেঃ ليبلوكم ايكم احسن عملا "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থঃ আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। প্রথম, নিয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের জন্য আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। نعيم مقيم (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خلدين فيها ابدا (তথায় চিরদিন বসবাস করবে) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চমঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হল, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কিরাম যে অভিহিত তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বিলাল (রা), রোমের হযরত সোহাইব (রা), পারস্যের হযরত সালমান (রা), মক্কার কোরাইশ ও মদীনার আনসাররা গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় এই প্রমাণ বহন করেঃ

هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد- فدائے يک تن بيگانه كه آشنا باشد
اللهم ارزقنا اتباعهم واجعل حبک احب الاشياء الينا وخشيتک
اخوف الاشياء عندنا ○

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ
عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ٰنِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র; তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়ত করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়ের তফসীর দেয়া হচ্ছে যে, হে মুহাম্মদ! তাদের) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পরিবার, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়—যা বন্ধ হওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা (বসবাস করা) পছন্দ কর (যদি এ সকল বস্তু) আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান (হিজরত না করার শাস্তি) আসা পর্যন্ত (যেমন সূরা নিসা ৯৭ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়ঃ)

ان الذين توفهم الملائكة (الى قوله) فاولئک ماوهم جهنم

আর আল্লাহ্ তাঁর বিধান লংঘনকারীদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন না। এদের মনোবাঞ্ছা হল উপরোক্ত সহায়-সম্পদ দ্বারা আরাম-আয়েশ লাভ। কিন্তু অতিসত্বর তাদের আশার বিপরীত মৃত্যু সবকিছু তছনছ করে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবার এ আয়াতটি নাযিল হয় মূলত তাদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতাপিতা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদের বলে দিনঃ যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানীদের কৃতকার্য করেন না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হল, যারা পার্থিব সম্পর্কের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর সব নাফরমানরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন পার্থিব সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান অর্থাৎ আখিরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখিরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারি উচ্চারণটি মূলত হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জিহাদের——যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, এ আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জিহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, হিজরত মূলত জিহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হলঃ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ "আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়ত করবেন না" এতে বলা হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জিহাদের দামামা বেজে ওঠার পর সকল সহায়-

সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহ্‌র রীতি হল তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল ঃ প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না, বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেত না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্‌র আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সবসময়ের জন্য ফরয।

দ্বিতীয় ঃ গোনাহ্ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সবসময়ের জন্য মুস্তাহাব। (বিস্তারিত অবগতির জন্য 'ফাত্‌হুলবারী' দ্রষ্টব্য)

উল্লিখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে দুনিয়াবী সম্পর্কের মোহে মোহিত হয়ে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য, তাকে আল্লাহ্‌র আযাবের অপেক্ষায় থাকা চাই।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় ঃ এ জন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তানসন্ততি ও ততক্ষণ অন্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র জন্য, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।"

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্-রসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তফসীর কাযী বায়যাবী (র) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ, অনেক বড় বড় আলিম ও পরহিযগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ যাদের হিফাযত করেন। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গত একথাও বলেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার শক্তি সামর্থ্যের

বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি দুনিয়াবী সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ্-রসূলের ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ দুনিয়াবী আকর্ষণ উপরোক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন কোন অসুস্থ লোক ঔষধের তিক্ততা বা অস্ত্রোপচারকে ভয় করে, কিন্তু তার বিবেক একে শান্তি ও আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্য কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থ-সম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরীয়তের কোন কোন হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতরূপে ভার বোধ করে এবং এ সত্ত্বেও সে শরীয়তের হুকুম পালন করে চলে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ্-রসূলের এ ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার ঊর্ধ্বে স্থান প্রাপ্তদের কাতারে শামিল রাখা হবে।

সন্দেহ নেই, ভালবাসার উন্নত স্তর হল, স্বাভাবিক চাহিদার পরাজয় বরণ। যার ফলে প্রিয়জনের হুকুম তামিল তিক্ত বস্তুকেও মিষ্ট করে তোলে। যেমন, দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম-আয়েশের অভিলাষীদের দেখা যায়, অসহ্য পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। মাস শেষে কতিপয় রৌপ্য মুদ্রা লাভের আশায় চাকরিজীবীরা নিরন্তর পরিশ্রম থেকে আরম্ভ করে তোষামোদ ও উৎকোচ পর্যন্ত কোন্ কর্মটি বাদ রাখে? এটি এজন্য যে, দুনিয়ার ভালবাসাকে সে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ
گرد گلہ توتیائے چشم گرگ

তেমনি আল্লাহ্, রসূল ও আখিরাতের প্রেমে যাঁরা পাগল তাদেরও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগীতে কষ্টবোধ করার পরিবর্তে এক অবর্ণনীয় আস্বাদ লাভ করেন। তাই শরীয়তের যে কোন হুকুম পালনে তাঁদের কোন কষ্টবোধ হয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছেঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "যার মধ্যে তিনটি লক্ষণ একত্র হয়, সে ঈমানের আস্বাদ পায়। তাহল, ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার কাছে সকল বস্তু থেকে অধিক প্রিয় হয়। ২. সে কোন মানুষকে ভালবাসে শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে। ৩. কুফর ও শিরক্ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার মত মনে হয়।

হাদীসে উল্লিখিত ঈমানের আস্বাদ বলতে বোঝায়, ভালবাসার সেই স্তর, যেখানে পেঁছে দুঃখ ও পরিশ্রমকে সুমিষ্ট মনে হয়। از محبت تلخہا شیریں شود জনৈক আরবী কবি বলেনঃ

وإذا حلت الحلاوة قلبا ـ نشطت في العبادة الأعضاء

—যখন কোন অন্তর ঈমানের স্বাদ পায়, তখন অঙ্গগুলো ইবাদতের দ্বারা লজ্জিত বোধ করে।" আর একেই কোন কোন হাদীসে 'ইবাদতের প্রফুল্লতা' বলে অভিহিত করা হয়। হযরত (সা) একথাও বলেন, "আমার চোখের প্রশান্তি হল নামাযের মাঝে।"

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে বলেন, আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু এ নিয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্র ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এজন্য সূফিয়ায়ে কিরাম তা হাসিলের জন্য মাশায়েখদের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন। তফসীরে 'রুহুল বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর মত নিজের জানমাল ও সন্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্র পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (র) স্বীয় তফসীরে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত ও শরীয়তের হিফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ
اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ثُمَّ
يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তার রসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হল কাফিরদের

কর্মফল। (২৭) এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন (যুদ্ধের) অনেক ক্ষেত্রে (কাফিরদের বিরুদ্ধে। যেমন বদর যুদ্ধ প্রভৃতি) এবং হোনাইন (যুদ্ধ)-এর দিনেও (তোমাদের সাহায্য করেন যার কাহিনী বড় অদ্ভুত, চমকপ্রদ), যখন (এ অবস্থা হয় যে,) তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও (কাফিরদের বাণ নিক্ষেপের ফলে) তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। অতপর (পরিশেষে) তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন তাঁর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রসূল ও মু'মিনদের (অন্তরগুলোর) প্রতি এবং (সাহায্যের জন্য) অবতীর্ণ করেন (আসমান থেকে) এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এতে তোমাদের মনোবল ফিরে আসে এবং জয়ী হও)। আর (আল্লাহ্) শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের (তারা নিহত ও বন্দী হয় এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে)। আর এটি হল কাফিরদের জন্য (দুনিয়ার) সাজা। (২৭) এরপর আল্লাহ্ (এ কাফিরদের মধ্য হতে) যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তওবার তওফীক দেন (ফলে অনেকে মুসলমান হয়) আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (যে, যারা মুসলমান হয় তাদের সকল অতীত অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাতের উপযুক্ত করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হোনাইন যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল এবং কিছু দরকারী বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বের সূরায় মক্কা বিজয় ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির বিবরণ ছিল।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়ঃ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة "আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হোনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আয়াতের শাব্দিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন হবে সহজ এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশ্যে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয় তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে মাযহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হোনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল তফাতে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশরা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজিন গোত্রে---যার একটি শাখা তায়েফের বনু সাকীফ নামে পরিচিত, হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের শিকার হব আমরা। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াজিন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা-গোত্রগুলোকে একত্র করে। আর সে গোত্রের মুষ্টিমেয় শ' খানেক লোক ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এখানে আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালিক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা---বনু কাআব ও বনু কিলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। এজন্য তারা বলে "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে একত্র হয়, তথাপি তিনি সকলের ওপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।"

যা হোক এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং যার যার সহায়-সম্পত্তিও সাথে রাখবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। এ কৌশলের ফলে যেন কারো পক্ষে পলায়নের সুযোগ না থাকে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেজুল-হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর (রা) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোট কথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফে অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব বিন আসাদ (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মোআয বিন জাবাল (রা)-কে লোকদের ইসলামী তালিম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধার স্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশের সরদার সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত (সা) বলেন, না, না, বরং ধার স্বরূপ নিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শুনে

সে একশ লৌহবর্ম এবং নওফেল বিন হারিস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম জুহরী (র)-র বর্ণনা মতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সা) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকি দু'হাজার ছিলেন আশেপাশের অধিবাসী, যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাঁদের বলা হত 'তোলাকা'। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত (সা) বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনি কিনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদ-উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও রণদৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন উসমানও ছিলেন, যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত শোনান। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা)-র হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা)-র হাতে মারা পড়েন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক-সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে হযরত (সা)-এর কাছে পৌঁছি। কিন্তু দেখি যে ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবূ সুফিয়ান বিন হারিস হযরত (সা)-এর হিফাযতে আছেন। এজন্য পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছি এবং সংকল্প নিই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁর আয়ু শেষ করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বক্ষের উপর রাখেন আর দু'আ করেন, "হে আল্লাহ্! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।" অতপর আমি যখন দৃষ্টি ওঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত (সা)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফির-দের সাথে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরত (সা)-এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমি প্রস্তুত। তাই কাফিরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খিদমতে হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে আর আমাকে

হত্যার জন্যে আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হল!

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর বিন হারেসের সাথে। তিনিও এ উদ্দেশ্যে হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর অন্তরে হযরত (সা)-এর ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফিরদের মুকাবিলা করে চলেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা বিন নায়ার (রা)-এর সাথে। তিনি 'আউতাস' নামক স্থানে পেঁছে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত (সা) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্‌ আমার হিফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! অনুমতি দিন, আল্লাহ্‌র এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত (সা) বলেন, চুপ কর, আমার দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্‌ আমার হিফাযত করে যাবেন। এই বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যা হোক, মুসলিম সেনাদল হোনাইন নামক স্থানে পেঁছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল বিন হান্‌যালা (রা) রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে হযরত (সা) বললেন, চিন্তা করো না! ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রসূলুল্লাহ্‌ (সা) হোনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন হাদ্দাদ (রা)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা রূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধপ্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনা-নায়ক মালিক বিন আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, "মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজ জাতির পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মুকাবিলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে।" বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণ-প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহোদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের

এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিন শ তেরজন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফির সেনা। তাই হোনাইনের বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 'হাকিম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনা মতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র না-পছন্দ যে, কোন মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করে থাকুক। তাই মুসলমানদের আল্লাহ্ এ কথাটি বুঝিয়ে দিতে চান।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফির সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবীদের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ, অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত (সা)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদের মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস (রা)-কে বলেন, উচ্চস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নিচে জিহাদের বায়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারা ওয়ালারা কোথায়? জান কোরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসাররাই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা)-এর এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীরা ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এদের সাহায্যে ফেরেশতা দল পাঠিয়ে দেন। এর পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফির সেনানায়ক মালিক বিন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এর পর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফির নেতা মারা পড়ে। কতিপয় মুসলমানের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য।

আলোচ্য প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে এল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গল, তারপর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন

রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলেন ঃ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

"অতপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর" এ বাক্যের অর্থ হল হোনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যেসব সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্র সান্ত্বনা লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হল, তাঁরা বিজয়কে খুব নিকটে দেখেছিলেন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহ্র সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, অন্য প্রকার হযরত (সা)-এর সাথে যারা সুদৃঢ় রয়েছেন, তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, "অতপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন তাঁর রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর।"

অতপর বলা হয় ঃ وانزل جنودا لم تروها এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল, যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হল ঃ وعذب الذين كفروا وذالك جزاء الكفرين

"আর শাস্তি দিলেন কাফিরদের এবং এটি হল কাফিরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের ব্যাপারে উল্লেখ হয় নিম্নরূপে ঃ

ثم يتوب الله من بعد ذالك على من يشآء والله غفور رحيم

"অতপর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্ অতীব মার্জনা-কারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হল।

হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার মারা পড়ে; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনীমত রূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছ' হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রূপা যা ওজনে চার মণের সমান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে গনীমতের এসব মালামালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন।

অতপর পরাজিত হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রসূলে করীম (সা) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে থাকেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হিদায়তের দোয়া করেন। অতপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'ইররানা নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'ইররানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এখানে মালে-গনীমত রূপে প্রাপ্ত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঠিক ভাগ-বাটোয়ারার সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ সদস্যের এক প্রতিনিধি যোহাইর বিন ছরদের নেতৃত্বে হযরত (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে হযরত (সা)-এর দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবূ ইয়ারকানও ছিলেন। তারা এসে বলেন —ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের অনুরোধ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমরা আবূ ইয়ারকান সূত্রে আপনার আত্মীয়ও হই। আমরা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এমনি দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা রোমান বা ইরাক সম্রাটের কাছে কোন অনুরোধ পেশ করি, তবে আশা যে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ আপনার আদর্শ চরিত্রকে সবার উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই আপনার কাছে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত।

রাহমাতুললিল আলামীনের জন্য এ অনুরোধ ছিল উভয় সঙ্কটের কারণ। তাঁর দয়া ও উদার নীতির দাবি ছিল ওদের সকল বন্দী ও মালামাল ফিরিয়ে দেওয়া। অপর দিকে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর রয়েছে মুজাহিদদের ন্যায্য দাবি। তাদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাই বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হযরত (সা) যে জবাব দিয়েছিলেন তা হল ঃ

"আমার সাথে আছে অসংখ্য মুসলিম সেনা, এরা এ সকল মালামালের দাবিদার। আমি সত্য ও স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। তাই তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিচ্ছি দু'টির একটি ; হয় বন্দীদের ফেরত নাও, নয়তো মালামাল নিয়ে যাও।" যে'টি চাইবে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তারা বন্দী মুক্তি গ্রহণ করল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সাহাবীকে একত্র করে একটি খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় আল্লাহ্র প্রশংসা করার পর বলেন ঃ

"তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে এখানে এসেছে। তাদের বন্দীদের মুক্তিদান সঙ্গত মনে করছি। তোমাদের যারা সন্তুষ্ট মনে নিজেদের অংশ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হতে পার, তারা যেন এদের প্রতি দয়াবান হয়। আর যারা প্রস্তুত হতে না পার, ভবিষ্যতের 'মালে ফাই' থেকে তাদের উপযুক্ত বদলা দেব।"

হযরত (সা)-এর এ খুতবার পর সর্বস্তর থেকে আওয়াজ আসেঃ 'বন্দী প্রত্যর্পণে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাযী।' কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) ন্যায়নীতি ও পরের হকের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক আছে বিধায় সমস্বরে তাদের এ সন্তুষ্টি প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই বলেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের কে সন্তুষ্ট-চিত্তে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করতে রাযী হয়েছ, কে লজ্জার খাতিরে নীরব রয়েছ। এটি মানুষের পারস্পরিক হক। সুতরাং প্রত্যেক গোত্র ও দলের সরদারগণ আপন লোকদের সঠিক রায় নিয়ে আমাকে যেন অবহিত করেন।

সেমতে তারা নিজ লোকদের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে হযরত (সা)-কে জানান যে, প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাযী আছে। একথা জানার পরই রসূলুল্লাহ (সা) হোনাইন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান করেন।

এই লোকদের কথাই আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ

ثم يتوب الله من بعد ذالك على من يشاء

অর্থাৎ এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন। হোনাইন যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হল, তার কিছু অংশ কোরআন থেকে এবং বাকি অংশ নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে।—(মাযহারী, ইবনে কাসীর)

আহ্কাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় বিভিন্ন আহ্কাম ও মাসায়েল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরী বিষয়। মূলত এগুলোর বর্ণনার জন্য ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হল।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্যঃ উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হিদায়েত হল মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

হোনাইন যুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, তা আল্লাহ্র নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফিরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না

পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতপর আল্লাহ্‌র গায়েবী সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়াঃ দ্বিতীয় হিদায়ত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তা হল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্বে মক্কার বিজিত কাফিরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হযরত (সা) তা করেন নি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হিদায়ত।

তৃতীয়ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হিদায়ত আছে, তাহল, আল্লাহ্ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দু'আর পরিবর্তে হিদায়ত লাভের যে দু'আ হযরত (সা) করেছেন---তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হল হিদায়তের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থঃ পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ ইসলাম ও ঈমানের হিদায়ত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাযীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদরা এ থেকে এই মাস'আলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনের চাঁদা আদায় করাও জায়েয নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে অথচ, অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থকড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ إِنْ شَآءَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(২৮) "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো (কদর্য আকীদার ফলে) অপবিত্র, সুতরাং (এই অপবিত্রতার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য যে হুকুম-আহকাম তার একটি হল) এ বছরের পর তারা যেমন মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ হেরেম শরীফের) নিকট (ও) না আসে (অর্থাৎ হেরেম শরীফের ত্রিসীমানায় যেন ঢুকতে না পারে)। আর যদি তোমরা (এ আদেশ বলবত হওয়ার ফলে) দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর (অর্থাৎ কায়-কারবার প্রায় এদের হাতে। এরা চলে গেলে কিরূপে চলা যাবে—যদি এরূপ মনে কর) তবে (ভরসা রাখ আল্লাহ্র উপর) আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (স্বীয় আহকামের রহস্য সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, (এ সকল এবং রহস্যের পূর্ণতা বিধানে) প্রজ্ঞাময় (তাই এই আদেশ জারি করলেন) এবং তিনি তোমাদের আজাব মোচনের ব্যবস্থাও করে দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা বরাআতের শুরুতে কাফির মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে সম্পর্কছেদ সম্পর্কিত বিধিবিধানের উল্লেখ করা হয়। সম্পর্কছেদের সারকথা ছিল বছরকালের মধ্যে কাফিরদের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ বাতিল বা পূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং এ ঘোষণার এক বছর পর কোন মুশরিক যেন হেরেমের সীমানায় না থাকে।

আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ কায়দায় বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়। এতে রয়েছে উপরোক্ত আদেশের হিকমত ও রহস্য এবং তজ্জনিত কতিপয় মুসলমানের অহেতুক আশংকার জবাব। আয়াতে উল্লিখিত نجس (নাজাস) শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ব্যাপক অর্থে পঙ্কিলতা যার প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ থাকে; ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন, 'নাজাস' বলতে চোখ, নাক ও হাত দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের যেমন, তেমনি জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহেরও অপবিত্রতা বোঝানো হয়। তাই 'নাজাস'

বলতে দৃশ্যমান ঘৃণিত বস্তুকেও বোঝায় এবং অদৃশ্য অপবিত্রতা যার ফলে শরীয়তে ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয় তাও বোঝায়। যেমন জানাবত, হায়েয, নেফাস পরবর্তী অবস্থা এবং ঐ সকল বাতেনী নাজাসত যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে যেমন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ ঘৃণিত স্বভাব।

উল্লিখিত আয়াতের শুরুতে انما শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা حصر বা কোন বস্তুর সার্বিক মর্মকে সীমিত করা হয়। তাই انما المشركون نجس এর মর্ম হবে মুশরিকরা সঠিক অর্থেই অপবিত্র। কারণ, এদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের অপবিত্রতা থাকে। তারা অনেকগুলো দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুকেও অপবিত্র মনে করে না। যেমন মদ ও মাদক দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্য অপবিত্রতা কিছু আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। যেমন স্ত্রীসঙ্গম ও হায়েয-নেফাস পরবর্তী অবস্থা। সে জন্য এ সকল অবস্থায় তারা গোসলকে আবশ্যক মনে করে না। অনুরূপ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ স্বভাবগুলোকেও তারা দূষণীয় মনে করে না।

তাই আয়াতে মুশরিকদের প্রকৃত খাঁটি অপবিত্র রূপে চিহ্নিত করে আদেশ দেওয়া হয়ঃ فلا يقربوا المسجد الحرام সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল-হারাম' বলতে সাধারণত বোঝায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকের আঙিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হেরেম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা কয়েক বর্গমাইল এলাকা ব্যাপী, যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ), যেমন মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামদের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহ্র আঙিনা নয়। কারণ মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা)-র গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহ্র আঙিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছেঃ الذين عهدتم عند المسجد الحرام তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হল 'হোদায়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে এর সন্নিকটে অবস্থিত---(জাস্সাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হেরেম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল।

তবে এ বছর বলতে কোন্টি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হল নবম হিজরী। কারণ, নবী করীম (সা) নবম হিজরীর হজ্জের মৌসুমে হযরত আলী ও আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর দ্বারা কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর মসজিদুল হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও? দ্বিতীয়, মসজিদুল হারামের জন্য হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ্জ ও ওমরার জন্য? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য, না আহলে-কিতাব কাফিরদের জন্যও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব, তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সা)-এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজীদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন্ দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ মদীনার ফিকাহশাস্ত্রবিদরা তথা ইমাম মালিক (র) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ, তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি জানাবতের গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (র)-এর একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকদের লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফিরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হল নবী করীম (সা)-এর এই হাদীস ঃ

"কোন ঋতুবতী মহিলা বা জানাবত যার জন্য গোসল ফরয হয়েছে, তার পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে, কাফির-মুশরিকরা জানাবতের গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হুকুমটি কাফির-মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট। অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশাদি নিষিদ্ধ নয়।——(কুরতুবী)। ইমাম শাফেয়ী (র)-র দলীল হল ছুমামা বিন উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে এক স্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম (সা) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে, উপরোক্ত আয়াতে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হল, আগামী

বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলীল হল, হজ্জের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা)-র দ্বারা কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করা হয় তাতে এ কথা ছিল ঃ لا يحجن بعد العام مشرك অর্থাৎ 'এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াতঃ فلا يقربوا المسجد الحرام অর্থাৎ 'মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না।' এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্জ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হল। ইমাম আবূ হানীফা (র) অতপর বলেন, হজ্জ ও ওমরা ছাড়া মুশরিকরা অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি-বৃন্দ নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কিরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরা তো অপবিত্র। হযরত (সা) তখন বলেছিলেন, "মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না"।—(জাসসাস)

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয় যে, কোরআন মজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না।" তবে সে কোন মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন বোধে প্রবেশ করতে পারে।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হল কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশংকা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হল। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফির-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানরাও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয় বরং পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হল ইসলামের দুর্গ। কোন অমুসলিম থাকতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-র উপরোক্ত তত্ত্বের সারকথা হল, কোরআন ও হাদীস মতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরী

বিষয় কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষটির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হেরেম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হেরেম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং অন্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, "এ বছরের পর—পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।" তারা শিরকী প্রথামতে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলে করীম (সা) এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন কাফির-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সা) নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেন নি। অতপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

বাকি থাকল কাফিরদের অপবিত্রতা এবং মসজিদগুলোকে নাপাকী থেকে পবিত্র করার মাস'আলা। এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, কোন মুসলমান প্রকাশ্য নাপাকী নিয়ে এবং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যদিকে কাফির-মুশরিক হোক বা আহলে-কিতাব, তারাও সাধারণত উল্লিখিত নাপাকী থেকে পবিত্র নয়, তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে তাদের জন্যও কোন মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়।

উক্ত আয়াত মতে, হেরেম শরীফে কাফির-মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য এক নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হল। কারণ, মক্কা হল অনুর্বর জায়গা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এখানে হয় না। বহিরাগত লোকেরা এখানে খাদ্যের চালান নিয়ে আসতো। এভাবে হজ্জের মৌসুমে মক্কাবাসীদের জন্য জীবিকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় হয়ে যেত। কিন্তু হেরেম শরীফে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে পূর্বাবস্থা আর বাকি থাকবে না। এ প্রশ্নের উত্তর আয়াতের এ বাক্যে আল্লাহ্ সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ وان خفتم عيلة الخ অর্থাৎ "তোমরা যদি অভাব-অনটনের ভয় কর তবে মনে রেখ যে, রিযিকের সকল ব্যবস্থা আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে কাফিরদের থেকে তোমাদের বেনিয়াজ করে দেবেন। "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বাক্য দ্বারা সন্দেহের উদ্রেক করা উদ্দেশ্য নয়। বরং বাক্যটি এ কথার ইঙ্গিতবহ যে, পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা যদিও মনে করবে যে, কাফিরদের হরম শরীফে আসতে না দেওয়ার ফলে আর্থিক সঙ্কট অনিবার্য কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উপকরণের মোহতাজ নন;

বরং বিলম্ব তাঁর ইচ্ছার। তিনি ইচ্ছা করলেই সবকিছু অনায়াসে হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের অভাব দূর করে দেবেন।"

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ
الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ
قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

(২৯) "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তার রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা বলে 'ওযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহ্র পুত্র।' এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টাপথে চলে যাচ্ছে।"

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(২৯) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে (পরিপূর্ণ) ঈমান রাখে না। আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সা) যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম (ইসলাম), যতক্ষণ না করজোড়ে তারা (অধীন ও প্রজা রূপে) জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) আর ইহুদী-(-দের কেহ কেহ) বলে (নাউযুবিল্লাহ) ওযাইর (আ) আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃস্টান দের অনেক) বলে মসীহ (আ) আল্লাহ্র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা (যার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই) এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে (ওরা হল আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। ওরা ফেরেশতাদের আল্লাহ্র কন্যারূপে অভিহিত করে। সে জন্য ইহুদী খৃস্টানেরাও ওদের কাফির বলে। অথচ তারাও সেই কুফরী উক্তির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। 'পূর্ববর্তী কাফির'—বলা এজন্য যে, মুশরিকরা গোমরাহীর অতি প্রাচীন স্তরের ছিল) আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ব্যাপারে কত জঘন্য মিথ্যার বেশাতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ হল তাদের কুফরী বাক্যসমূহ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পূর্ব আয়াতে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। 'তফসীরে-দুররে মনসূরে' মুফাসসিরে-কোরআন হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দু'টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহ্‌লে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফির দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন-না-কোন আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু ইহুদী ও খৃস্টানদের। কারণ আরবের আশেপাশে এই দু-সম্প্রদায়ই আহ্‌লে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়ঃ — أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِينَ

অর্থাৎ তোমরা হয়ত বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুসম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম--- (আন'আম ঃ ১৫৬)।

আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহ্‌লে-কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফির সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফিরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ-উদ্দেশ্যে যে, ইহুদী-খৃস্টানেরা অন্তত তাওরাত-ইঞ্জিল এবং হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-র প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব পূর্বের আম্বিয়া (আ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এক দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে আছে তাওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের রয়েছে রসূলে করীম (সা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমত لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী খৃস্টানেরা তো বাহ্যত আল্লাহ্, পরকাল ও রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী খৃস্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদী কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খৃস্টান কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবি হল অসার।

অনুরূপ, আখিরাতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহ্‌লে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, রোজ কিয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখিরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদী-খৃস্টানেরা আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হলঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সূদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য যা তাওরাত ও ইঞ্জিলে হারাম ছিল কিন্তু তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাস'আলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয় বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরং তা গুনাহ্ ও ফাসিকী।

আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ 'যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ, 'বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফিরদের প্রাণের বিনিময় গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য ঃ কুফর ও শিরক হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করবে স্বয়ং সরকার। অন্যদিকে তারা নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এ হল জিযিয়া কর।

দুপক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয় এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া, যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগ্লিব গোত্রীয় খৃস্টানদের সাথে হযরত উমর (রা)-এর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নিসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়া কর প্রদান করবে।

মুসলমানরা যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসী-দের তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার হবে যা হযরত উমর ফারূক (রা) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তাহল, উচ্চ বিত্তের জন্য চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্য দু'দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্ন বিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সম-মূল্যের অর্থ। গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্ম যাজক-দের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রসূলে করীম (সা)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি যেন করা না হয়। হযরত